



Gillette পরিচালনা পর্ষদ

(যারা পরিচালিত হয় তাদের চোখে)

“ক্লিনিক রোগীদের সারিয়ে তোলে। যত্নশীল সমাজ মানুষের পাশে দাঁড়ায়।”

I. পরিচালকেরা ও পরিচালনা পর্ষদ

প্রতিষ্ঠান কংক্রিট থেকে জন্মায় না।

জন্মায় সিদ্ধান্ত থেকে।

সব ভবনই একই মালমশলায় তোলা যায়, কিন্তু একটাকে অন্যটার থেকে আলাদা করে তার নেতৃত্বে থাকা মানুষদের দূরদৃষ্টি।

প্রতিটি সংগঠনের পেছনে থাকে ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস, ভিন্ন অভিজ্ঞতা, ভিন্ন দক্ষতার মানুষ। তারা একটা যৌথ দায়িত্ব ভাগ করে নিতে রাজি হয়েছে, যদিও একই লক্ষ্যে কীভাবে পৌঁছানো যায় তা নিয়ে তাদের ভাবনা আলাদা।

পরিচালকেরা প্রায়ই আসেন ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরে।

কেউ উঠে আসেন প্রতিষ্ঠানের ভেতর থেকেই।

কেউ আসেন অন্য কোথাও অর্জিত পেশাগত অভিজ্ঞতা নিয়ে।

প্রত্যেকে নিয়ে আসেন জ্ঞান, বিশ্বাস, আর নিজের ভূমিকাকে বোঝার আলাদা আলাদা ধরন।

আর যেখানেই দায়িত্ব আর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকে, সেখানে যা হয় — দৃষ্টিভঙ্গি সব সময় মেলে না।

প্রত্যেকে মনে করেন, সমাধানের একটা অংশ তাঁর হাতেই আছে।

প্রত্যেকে বাস্তবকে পড়েন নিজের যাপিত জীবন দিয়ে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তফাত গড়ে দেয় মতামত নয়।

গড়ে দেয় ফলাফল।

আর ফলাফলের দিকে প্রতিদিন তাকিয়ে থাকে তারাই, যারা নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোর পরিণাম সবার চেয়ে বেশি ভোগ করে: রোগীরা আর তাদের পরিবার।

এই কারণেই একটা স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান যতটা না পদক্রমের মতো, তার চেয়ে বেশি অর্কেস্ট্রার মতো।

পরিচালক আছেন।

তত্ত্বাবধায়ক আছেন।

নিয়মপদ্ধতি আছে।

কিন্তু চূড়ান্ত ফল নির্ভর করে এই যাত্রায় যারা অংশ নেয়, সেই সব মানুষের মধ্যকার সুরসংগতির ওপর।

যারা নেতৃত্ব দেয়, তারা স্বরলিপি ঠিক করে।

যারা রোজ কাজ করে, তারা তাকে সংগীতে বদলে দেয়।

আর প্রায়ই এই সহযোগিতার গুণমান দিয়েই মাপা হয় নেতৃত্বের আসল মূল্য।

কারণ হুকুম দেওয়া একটা কাজ।

নেতৃত্ব দেওয়া একটা দায়িত্ব।

আর সেবায় নিবেদিত সংগঠনে এই দুয়ের দূরত্ব বিরাট তফাত গড়ে দিতে পারে।

দূরদৃষ্টি থেকে যায় পরিচালনা পর্ষদ আর তার উপদেষ্টাদের এখতিয়ারে, আর তা অনেকখানি নির্ভর করে তাঁদের সংস্কৃতির ওপর এবং যে পথ তাঁদের সেখানে এনেছে তার ওপর।

পর্ষদে যাঁরা বসেন, তাঁদের সবাই ওই ভূমিকার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে আসেননি। কখনও কখনও দরজা খুলে দেয় আর্থিক সামর্থ্য — একটা উত্তরাধিকার, হঠাৎ পাওয়া সম্পদ, একেবারে অন্য ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য — অথচ সেই সামর্থ্যের সঙ্গে যত্নের কোনো সংস্কৃতি থাকে না। আর টাকা একা কাউকে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান চালাতে শেখায় না।

এ এমন এক সাংগঠনিক সংস্কৃতি, যা ভেতরে ঢোকা মানুষকে অবাক করে।

আমার মনে আছে এক উপদেষ্টার কথা, যাঁর চিকিৎসা বিষয়ে কোনো দক্ষতাই ছিল না, অথচ করিডরে তাঁর প্রধান চিন্তা ছিল এটা দেখা যে রোগীদের জন্য সংরক্ষিত পার্কিংয়ের জায়গা কর্মীরা দখল করছে কি না। ছোট্ট একটা ব্যাপার, তবু অনেক কিছু ফাঁস করে দেওয়ার মতো: ওই মানুষটির কাছে আসল অগ্রাধিকার কী ছিল, তা নিয়ে এটা অনেক কথাই বলে দিত।

আরেকটু দূরে তাকালেই যথেষ্ট হত — যা আগে থেকেই আছে শুধু তা পাহারা না দিয়ে, লাভ তোলার জন্য বিনিয়োগ করা। যারা একটা প্রতিষ্ঠানের মালিক আর যারা তা চালাতে জানে, তাদের তফাতের ফয়সালা হয় এখানেই।

প্রতিটি জায়গার একটা চরিত্র থাকে। আর সেই চরিত্র জন্মায় যারা তার নেতৃত্ব দেয় সেই মানুষদের থেকে।

II. উপসংহার

প্রতিষ্ঠান গড়া হয় বিনিয়োগ দিয়ে।

আস্থা গড়া হয় মানুষ দিয়ে।

নেতৃত্ব মাপা হয় কে কোন পদে আছে তা দিয়ে নয়, বরং ভিন্ন ভিন্ন দক্ষতাকে একটা অভিন্ন লক্ষ্যের কাজে লাগানোর ক্ষমতা দিয়ে।

কারণ শেষ পর্যন্ত, যে সংগঠন ঠিকঠাক চলে, তার পেছনে কখনওই শুধু একজন মানুষ থাকে না।

সব সময় থাকে একটা দল।

III. লেখকের পাতা

এই লেখা কারও ফরমায়েশে লেখা হয়নি।

এটি বিক্রি করা হয়নি।

বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এটি তৈরি হয়নি।

এটি লেখা হয়েছে পুনর্বাসনের, মানুষের মর্যাদার আর মানুষে-মানুষে সম্পর্কের মূল্যের সাক্ষ্য দিতে।

একমাত্র যে পারিশ্রমিক চাওয়া হয়েছে, তা প্রতীকী এক ডলার — কাজের দাম হিসেবে নয়, বরং যত্ন, আশা আর দায়িত্বের সংস্কৃতির প্রতি যৌথ অঙ্গীকারের নিদর্শন হিসেবে।

ফের্দিনান্দে